

বাংলাদেশের নারী, জাতীয় সংসদ ও সংরক্ষিত আসন

আছমা বিন্তে ইকবাল*

Abstract: Bangladesh became independent through a blood-shaded war. In order to establish a democratic state, the constitution was promulgated in 1972 with a view to the great liberation war. The constitution vividly declared the equal rights of both male and female in all sphere of life. The national parliament, the apex policy making body of the state made provision of women's participation in the national parliament which was defined in the constitution of 1972 and a limited number seats were reserved for women. The provision was made for upliftment of women considering their prevailing socio-economic, religious and cultural trends at that time. But after 35 years of independence, today, reserved seats for women in the parliament through such indirect election system is no longer popularly accepted. Because, the real political empowerment of women is absurd in this system. Therefore, recently, civil society, different cultural and women organisations, news media have been demanding for direct election amongst interested women candidates for those reserved seat. The proposed system would not only accelerate the real empowerment of women but also constitute effective and meaningful democratic state structure. The progressive and enriched Bangladesh can be established through real political infrastructure and efforts.

চলমান বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন। বিশ্বায়ন কথাটি একদিকে যেমন অর্থনীতিমুখী অন্যদিকে এর অন্তর্নিহিত অনুসঙ্গগুলো রাজনৈতিক। অধুনা Political System বলতে যে ব্যাপক ও সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বুঝায় তার মধ্যেই বিশ্বায়নের জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা ও সূত্রসমূহ সুনির্দিষ্ট হয়। এখানে Political System এর সাথে বিশেষ ভাবে যুক্ত নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বায়নের পূর্বশর্ত। একটি উন্নয়নশীল তথা আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের জাতীয় শক্তির প্রধান মানদণ্ড এর দক্ষ জনগোষ্ঠী। মানব সম্পদের এ ধারণা নারী পুরুষ নির্বিশেষে। কিন্তু আমাদের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় উন্নয়নের ধারায় নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কেবল জেভার বৈষম্যের কারণে দেশের অর্ধেক জনশক্তি হিসাবে নারীর সার্বিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত। বিশেষ করে জাতীয় নীতি নির্ধারণে জনপ্রতিনিধি হিসাবে নারীর অবস্থান হতাশাজনক। বর্ণ বৈষম্যহীন সমৃদ্ধশালী ও

* প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সুখী বাংলাদেশের যে আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়ে গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ করেছিল তা অনেকটা অপূরণীয় থেকে গেছে। গণতন্ত্র অর্জিত হলেও গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত নারীর রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্র স্বাধীনতাভীর ৩৫ বছরেও কাজিফত ভাবে প্রস্তুত হয়নি। অথচ বাস্তবতা বার বার আমাদের এ সমস্যার মুখোমুখি করেছে।

আমরা যদি ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে নারীরা সবসময়ই একটি ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে। ধর্ম থেকে শুরু করে সংবিধান, মানবাধিকার সংস্থা, জাতিসংঘ বিভিন্ন সামাজিক নারীভিত্তিক সংগঠন, নারীকেন্দ্রিক সম্মেলন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবসময় বলিষ্ঠ ভূমিকায় সোচ্চার ছিল। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকনির্দেশনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে আল কুরআনে। ইসলামের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সর্বপ্রথম নারী জাতিকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। কুরআনে বর্ণিত আছে

'Unto men a fortune from that which they have earned, and unto woman a fortune from that which they have earned (4.32).'

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে নরনারীকে একসাথে মানবমণ্ডলী বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এতে নরনারীর কোন পার্থক্য নেই বরং সকলেই এতে সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের বহু স্থানে “হে বিশ্বাসীগণ” বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে নরনারী নির্বিশেষে সকল বিশ্বাসী অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আল্লাহর নিকট সকল নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে নারীর অধিকার ঘোষিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদ গুলো হল ১০, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৬৫। সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সমানাধিকারের নিশ্চয়তার কথা বলা হয়েছে। নারীর সামাজিক, আর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকারসহ অন্যান্য অধিকারগুলোর ঘোষণা সংবিধানের উপরোক্ত বিধানাবলিতে সুস্পষ্ট। আবার অসম আইনগুলোকে সংবিধানে অবৈধ ও বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নারীর বিভিন্নমুখী অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ বিভিন্নমুখী সনদ অনুমোদন করেছে বিভিন্ন সময়ে। জাতিসংঘের নারীর রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদের প্রধান নীতিগুলো নিম্নরূপ (জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৫২ সালে অনুমোদিত) :

- পুরুষের মত সমান শর্তে সকল নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রদান।
- সকল অবকাঠামোতে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবার অধিকার।
- সরকারের সকল কাজকর্মে অংশগ্রহণের অধিকার।
- বেসরকারি সংস্থা ও সমিতিসমূহের কাজে অংশগ্রহণের অধিকার।

• আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার।

বিশ্বব্যাপী নারীর অধিকার আদায়ে বিশ্বনারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সময়ে। প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মেক্সিকোয় ১৯৭৫ সালে। প্রথম নারী সম্মেলনে ১৯৭৬-১৯৮৫ কে নারী দশক হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এই দশকেই ১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ যা নারীর আন্তর্জাতিক বিল অব রাইটস হিসেবে অভিহিত। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রে (পি আর এস পি) মূলধারায় সুস্পষ্টভাবে জেভার সমতা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৫৫তম অধিবেশনে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনের প্রয়াসে গৃহিত মিলেনিয়াম ঘোষণার কয়েকটি লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে যা মিলেনিয়াম ডিভেলপমেন্ট গোলস বা এমডিজি নামে পরিচিত। মিলেনিয়াম ডিভেলপমেন্ট গোলস এর ৩ নং গোলটি হল জেভার সমতা ত্বরান্বিত করণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন। সংবিধান অনুযায়ী নারী অধিকার রক্ষায় ও বিকাশে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় কাউন্সিল (NCWD), উইড ফোকাল পয়েন্টস (WID Focal points), জেলা ও উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (District and Upazila Woman Development Co-ordination Committee), জাতীয় মহিলা সংস্থা (Jatiya Mohila Sangstha) সহ আরও অনেক সামাজিক ও মহিলা বিষয়ক সংগঠন। এছাড়া স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে যে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে প্রথমটি ছাড়া অন্যান্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোতে নারীর অধিকার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।

সূত্র : মাননান, অধ্যাপক মোঃ আব্দুল এবং মেরী, শামসুন নাহার খানম “নারী ও রাজনীতি” পৃষ্ঠা ১৮৮-১৯১। রহমান, শাহীন “মিলেনিয়াম ডিভেলপমেন্ট গোল” ৩৪ তম সংখ্যা

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ভোটাধিকার, প্রেক্ষাপট বিশ্ব ও বাংলাদেশ

ক্ষমতায়নের শাব্দিক অর্থ হল সামর্থ্য অর্জনের প্রক্রিয়া আর নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বলতে বুঝায় তার নিজের ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণসহ নারীর বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সেগুলো বাস্তবায়নের সামর্থ্য। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বলতে জাতীয় সংসদ, মন্ত্রিপরিষদ, আইনপ্রণয়ন ও সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর সক্রিয় ও কার্যকর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগকে বুঝায়। আর এই রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রথম ও প্রাথমিক ধাপ কিংবা পূর্বশর্ত হল ভোটাধিকার।

মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ইতিবাচক ধারার সূচনা হয়। ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত জন স্টুয়ার্ট মিলের নারীর অবদমন সম্পর্কে লেখা বইকে ধরে নেয়া হয় নারী অধিকার বা নারী মুক্তির চিরন্তন বাণী। তাঁর স্ত্রী হ্যারিয়েট টেইলর মিল কর্তৃক লিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ “On the Enfranchisement at Woman” মেয়েদের ভোটাধিকার, রাজনৈতিক অধিকারের প্রথম সোপান। স্বাধীনতা লাভ কিংবা রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া

সম্পন্ন হবার পর বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র নারীর ভোটাধিকার উপেক্ষা করে গেছে। অবশ্য পরবর্তীতে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে বিভিন্ন দেশে। আধুনিক বিশ্বে নারী প্রথম ভোটাধিকার লাভ করে ১৮৯৩ সালে নিউজিল্যান্ডে। এর আগে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, চীন, জাপানসহ কোন দেশেই নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত ছিল না। অবশ্য কালক্রমে বিভিন্ন দেশে নারী ভোটাধিকার লাভ করলেও আজও কতিপয় দেশে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত নয়।

সারণি-১: বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারীর ভোটাধিকার লাভের সময়কাল

দেশ	ভোটাধিকার লাভ	দেশ	ভোটাধিকার লাভ
নিউজিল্যান্ড	১৮৯৩	যুক্তরাষ্ট্র	১৯২০
অস্ট্রেলিয়া	১৯০২	গ্রিস	১৯২৭
ফিনল্যান্ড	১৯০৬	তুরস্ক	১৯৩০
নরওয়ে	১৯০৭	ফ্রান্স	১৯৪৪
ডেনমার্ক	১৯১৫	জাপান	১৯৪৫
যুক্তরাজ্য	১৯১৮	চীন	১৯৪৯
জার্মানী	১৯১৮	ভারত	১৯৫০
রাশিয়া	১৯১৮		

সূত্র : মাসিক প্রফেসর কারেন্ট অ্যাক্ফোর্স মার্চ ২০০৪

১৯২০ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার নারীরা অরাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে কাজ করেছে। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে এবং বিংশ শতকের শুরুতে কিছু নারী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও সক্রিয় ছিল। এসব আন্দোলনগুলো হল- স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন, আইন অমান্যকারী আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন ইত্যাদি। ব্রিটিশ তাড়ানো এবং স্বাধীনতা অর্জনই ছিল এসব আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। তখন পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। মূলত তখন নারীরা সমর্থনকারী হিসাবেই ভূমিকা রেখেছে মাত্র।

১৯১৭ সালে ভারতের প্রথম মহিলা এসোসিয়েশন গঠিত হয়। যার নাম “উইমেন এসোসিয়েশন” এই এসোসিয়েশনের সভাপতি এ্যানি বেসান্টসহ আরও দুজন ব্রিটিশ নারী ডরোথী জিনারাজাদাস ও মার্গারেট কাজিনস নারী অধিকার আন্দোলনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ১৯১৭ সালের ১৮ই ডিসেম্বর সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে একটি নারী প্রতিনিধি দল তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ড ও ভারত সচিব মন্টেগুর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন যার উল্লেখযোগ্য দিক হল:-

- নারীদের শিক্ষা;
- নারীদের স্বাস্থ্য;
- মাতৃমঙ্গলের উন্নত ব্যবস্থা; এবং

সম্পন্ন হবার পর বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র নারীর ভোটাধিকার উপেক্ষা করে গেছে। অবশ্য পরবর্তীতে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে বিভিন্ন দেশে। আধুনিক বিশ্বে নারী প্রথম ভোটাধিকার লাভ করে ১৮৯৩ সালে নিউজিল্যান্ডে। এর আগে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, চীন, জাপানসহ কোন দেশেই নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত ছিল না। অবশ্য কালক্রমে বিভিন্ন দেশে নারী ভোটাধিকার লাভ করলেও আজও কতিপয় দেশে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত নয়।

সারণি-১: বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারীর ভোটাধিকার লাভের সময়কাল

দেশ	ভোটাধিকার লাভ	দেশ	ভোটাধিকার লাভ
নিউজিল্যান্ড	১৮৯৩	যুক্তরাষ্ট্র	১৯২০
অস্ট্রেলিয়া	১৯০২	গ্রিস	১৯২৭
ফিনল্যান্ড	১৯০৬	তুরস্ক	১৯৩০
নরওয়ে	১৯০৭	ফ্রান্স	১৯৪৪
ডেনমার্ক	১৯১৫	জাপান	১৯৪৫
যুক্তরাজ্য	১৯১৮	চীন	১৯৪৯
জার্মানী	১৯১৮	ভারত	১৯৫০
রাশিয়া	১৯১৮		

সূত্র : মাসিক প্রফেসর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স মার্চ ২০০৪

১৯২০ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার নারীরা অরাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে কাজ করেছে। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে এবং বিংশ শতকের শুরুতে কিছু নারী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও সক্রিয় ছিল। এসব আন্দোলনগুলো হল- স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন, আইন অমান্যকারী আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন ইত্যাদি। ব্রিটিশ তাড়ানো এবং স্বাধীনতা অর্জনই ছিল এসব আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। তখন পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। মূলত তখন নারীরা সমর্থনকারী হিসাবেই ভূমিকা রেখেছে মাত্র।

১৯১৭ সালে ভারতের প্রথম মহিলা এসোসিয়েশন গঠিত হয়। যার নাম “উইমেন এসোসিয়েশন” এই এসোসিয়েশনের সভাপতি এ্যানি বেসান্টসহ আরও দুজন ব্রিটিশ নারী ডরোথী জিনারাজাদাস ও মার্গারেট কাজিনস নারী অধিকার আন্দোলনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ১৯১৭ সালের ১৮ই ডিসেম্বর সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে একটি নারী প্রতিনিধি দল তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ড ও ভারত সচিব মন্টেগুর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন যার উল্লেখযোগ্য দিক হল:-

- নারীদের শিক্ষা;
- নারীদের স্বাস্থ্য;
- মাতৃমঙ্গলের উন্নত ব্যবস্থা; এবং

■ পুরুষের সাথে একই সঙ্গে ভোটাধিকার দাবি।

এরপর নারীর ভোটাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৯২১ সালে গঠিত হয় বঙ্গীয় নারী সমাজ। এই সংস্থার তৎপরতা ও চাপের মুখেই ভারতের প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর উপর তাঁদের অভ্যন্তরীণ বিষয় ছেড়ে দেয়া হয়। এর ফলে সর্বপ্রথম মাদ্রাজের আইনসভা ১৯২১ সালের মধ্যে ভারতের সকল প্রাদেশিক পরিষদে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভোটাধিকার মঞ্জুর করা হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক আইন পরিষদে মহিলাদের জন্য ৪১টি আসন সংরক্ষণ করা হয়। ভারতীয় আইন সভায় সংরক্ষিত আসনের নীতিমালার বিরোধিতা করেছিল প্রতিনিধিত্বশীল নারী সংগঠনগুলো। কেননা তৎকালীন নীতিমালায় ভোটাধিকার পেয়েছিল কেবল শিক্ষিত এবং ন্যূনতম ২১ বছর বয়সী বিবাহিত নারীরা। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর ৫৬জন মহিলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে যোগদান করেন। এর মধ্যে ৪১ জন সংরক্ষিত নারী আসনে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ১০ জন নারী অসংরক্ষিত আসনে জয়লাভ করেন। ১০ জনের মধ্যে ৫ জনই আইন পরিষদের মনোনয়ন প্রাপ্ত। এই ভোটাধিকার ব্রিটিশরা রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় একটা বিধিমালা হিসাবে গ্রনয়ণ করেছে, যা নারীর রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি হিসাবে নয় বলে মনে করেন তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তাবিদরা।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তানের নারীরা সীমিত আকারে ভোটাধিকার পায়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানের অধীনে জাতীয় পরিষদে নারীদের জন্য কোন আসন সংখ্যা ছিল না। ১৯৬২ সালের সংবিধানের অধীনে জাতীয় পরিষদে ৬টি মহিলা আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। ৩টি পূর্ব এবং ৩টি পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। ১৯৬৭ সালের এক সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে মহিলা আসন ৮টিতে উন্নীত করা হয়। ৪টি পূর্ব ও ৪টি পশ্চিম পাকিস্তানে। এই নগণ্য মাত্রায় সংরক্ষিত আসনে নারীদের তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়নি। এরপর রাজনৈতিক পটপরিক্রমায় স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। স্বাধীনতাভোর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। উত্তরাধিকার ঐতিহ্যের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ভোটাধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন নারী যখন স্বাধীন সিদ্ধান্তে ভোট দেবার সুযোগ পাবে তখন ভোটাধিকার প্রয়োগই তার মধ্যে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানসিকতা সৃষ্টি করবে। এতে করে নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। স্বাধীন ও প্রভাবমুক্ত ভোটাধিকারই নারীর মধ্যে জাগ্রত করতে পারে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাগিদ। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন তথা জাতীয় সংসদে বাংলাদেশের নারীর প্রতিনিধিত্বে স্বাধীন ভোটাধিকারের কোন বিকল্প নেই। ১৯৭২ সালের সংবিধানে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হলেও আজকে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি গ্রামে নারীরা ভোটাধিকার প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত হয়ে উঠতে পারেনি। ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারীর ভোট প্রদান ও ভোট যুদ্ধে জয়ী হবার সাফল্য থাকলেও সে সময় ৯টি জেলার ১০টি ইউনিয়নের ৫০ হাজারেরও বেশি নারী ভোটের ভোট দেয়া থেকে বিরত ছিল। শুধু তাই নয় ২০০১ সালের মাস মিডিয়া সেন্টার দেশব্যাপী এক জরিপ চালিয়ে দেখিয়েছে যে, ৯টি জেলার ১০টি ইউনিয়নের ৫০ হাজারেরও বেশী নারী ভোটের ৩২ বছর থেকে ৮১ বছরের বেশি সময় ধরে ভোট দানে বিরত রয়েছে (তথ্য সূত্র:

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ঠা জুলাই, ২০০১)। মাস মিডিয়া সেন্টার এই এলাকাগুলো সনাক্ত করেছে। এই এলাকাগুলো হল, মাদারীপুর জেলার কালিকপুর ইউনিয়ন, পটুয়াখালী জেলার পান্ধাশিয়া, ঝালকাটি জেলার মগর ইউনিয়ন, গোপালগঞ্জ জেলার চন্দ্রদীঘলিয়া, বিনাইদহ জেলার সুরাট, নোয়াখালী জেলার দুয়ানী ও দুর্গাপুর, কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বর, ফেনীর মহামায়া, লক্ষীপুর জেলার বামনি ইউনিয়ন। শুধু এই ১০টি ইউনিয়নই নয় দেশের আরও অনেক এলাকায় এমনটি দেখা যায়। চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ রূপসা ইউনিয়নের নারীরা তিন যুগেরও বেশি সময় ধরে ভোট দানে বিরত রয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে ১৯৬৯ সালে হাসান মওদুদ জৈনপুরী (র) নারীদের ভোট না দেয়ার নির্দেশ দেন, যা বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। সর্বশেষ ভোটের তালিকা অনুযায়ী রূপসা ইউনিয়নে নারী ভোটারের সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার (তথ্য সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো ২১ নভেম্বর ২০০৬)।

বিশ্ব পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধিত্ব

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি হচ্ছে পার্লামেন্ট। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীর সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা ও সেখানে তাঁদের প্রতিনিধিত্বের অবস্থা জানার আগে বিশ্ব পার্লামেন্টে নারীর অবস্থা জানা প্রয়োজন। বিশ্বে এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রথম আগমন ঘটে ১৯০৭ সালে ফিনল্যান্ডে। ১৯০৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে ফিনল্যান্ডে ১৯ জন নারী প্রথম সে দেশের পার্লামেন্টের সদস্য হন। ব্রিটিশ কমন্স সভায় ১৯১৮ সালে প্রথম কোন নারী সদস্য হন। যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে প্রথম কোন নারী সদস্য হন ১৯২২ সালে। শ্রীলংকার শ্রীমাতো বন্দর নায়েক প্রথম নারী যিনি প্রধানমন্ত্রী ও পার্লামেন্টের নেতা নির্বাচিত হন ১৯৬০ সালে। কোন দেশের সংসদে একই সঙ্গে সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতা এই দুই পদে দুজন নারী নির্বাচিত হবার বিরল ঘটনা ঘটে কেবল বাংলাদেশে। ১৯৯১ সালে বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের পঞ্চম সংসদে সংসদ নেতা ও শেখ হাসিনা বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। আজকেও ঘুরে ফিরে এই দুই নেত্রী দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক পদ দুটিতে অধিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু তারপরও দেখা যায় বিশ্বে এবং বাংলাদেশের পার্লামেন্টে নারীর অবস্থান পুরুষের তুলনায় অনেক কম।

সারণি-২: বিভিন্ন সময়ে বিশ্বে পার্লামেন্টে নারীর অবস্থান

দেশ	মোট সদস্য	নারী সদস্য	শতকরা হার
সুইডেন (নির্বাচন ২০০২)	৩৪৯	১৫৮	৪৫.২৭%
নরওয়ে (১৯৯৭)	১৬৫	৫৯	৩৫.৭৫%
ফিনল্যান্ড (১৯৯৯)	২০০	৭৪	৩৭%
বুটেন (২০০১)	৬৫১	১১৬	১৭.৮%
যুক্তরাষ্ট্র (সিনেট)	১০০	১৪	১৪%
ভারত (২০০১)	৫৪৫	৪৩	৭.৮%
বাংলাদেশ (২০০১)	৩০০	৭	২.৩%

(সূত্র: মাসিক প্রফেসর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জুন, ২০০৪)

সার্বিকভাবে বিশ্বের পার্লামেন্টের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, রাশিয়া, ইতালী প্রভৃতি উন্নত ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা বেশ কম। একমাত্র সুইডিশ পার্লামেন্টে পুরুষ মহিলা প্রতিনিধি প্রায় সমান সমান, পুরুষ ৫৪.৭% ও মহিলা ৪৫%। সুইডেন ছাড়া ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, কলম্বিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় মন্ত্রী পর্যায়ে নারী অংশগ্রহণ সন্তোষজনক। পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধির শীর্ষ দেশগুলো হচ্ছে নরওয়ে (৩৬.৪%), আইসল্যান্ড (৩৪.৯%), নেদারল্যান্ড (৩৬.৭%), ডেনমার্ক (৩৮.০%), ফিনল্যান্ড (৩৬.৫%), অস্ট্রিয়া (৩৩.৯%), জার্মানি (৩২.২%), নিউজিল্যান্ড (২৯.২%), আর্জেন্টিনা (৩০.৭%), সিসিলিস (২৯.৪%), কোস্টারিকা (৩৫.১%), কিউবা (৩৬%), সেন্টলুসিয়া (৩৬.৪%), দক্ষিণ আফ্রিকা (২৯.৮%),। পক্ষান্তরে পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধিত্বের হার সবচেয়ে কম হচ্ছে নাইজার (১.২%), বাংলাদেশ (২.৩৩%), ইথিওপিয়া (৭.৭%), মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র (৭.৩%), চাঁদ (৫.৮%), নাইজেরিয়া (৩.৪%), ইয়েমেন (০.৭%), কেনিয়া (৭.১%), পাকিস্তান (৫.৯%), টগো (৭.৪%), পাপুয়া নিউগিনি (০.৯%), সোয়াজিল্যান্ড (৩.১%), ভানুয়াতু (১.৯%) ইরান (৪.১%), আর্মেনিয়া (৩.১%), শ্রীলংকা (৪.৪%), তুরস্ক (৪.৪%), জর্ডান (১.৩%), মালদ্বীপ (৬%), দক্ষিণ কোরিয়া (৫.৯%) প্রভৃতি দেশে। কয়েকটি দেশ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পার্লামেন্ট নারীর জন্য এক তৃতীয়াংশে আসন নির্ধারণ করেছে। যেমন, আর্জেন্টিনায় এক তৃতীয়াংশ নারী সদস্য মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় সেখানে রাতারাতি পূর্বের তুলনায় নারী প্রতিনিধির সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। ১৯৯০ সালে যেখানে ছিল মাত্র ৬.৩% বর্তমানে ৩০.৭% এ উন্নীত হয়েছে (সূত্র: মাসিক প্রফেসর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, মার্চ, ২০০৪)।

বিশ্বব্যাপী পার্লামেন্টে ১৯৮৫ সালে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ১২.১%। ১৯৮৮ সালে এই হার বেড়ে দাঁড়ায় ১৪.৮%। ১৯৯০ সালে তা আবার নেমে ১১.৭% এসে পৌঁছালেও বর্তমানে বিশ্ব পার্লামেন্টগুলোতে নারী সদস্যের গড় হার ১৩.৮%। আরেক তথ্য অনুযায়ী, গত ৫১ বছরে ১৮৬টি দেশের মধ্যে মাত্র ৩৮টিতে নারীরা পার্লামেন্টে সভাপতিত্ব করার সুযোগ পেয়েছে। ১৯০৭ সাল থেকে নারীরা পার্লামেন্টে সদস্য হিসাবে কাজ করলেও সামগ্রিকভাবে পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা উজ্জ্বল নয়। গ্রেটব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য পশ্চিমা উদার গণতান্ত্রিক দেশের আইনসভাগুলোতে নারীর অবস্থা প্রান্তিক পর্যায়ে। নারীর পার্লামেন্টারী অবস্থানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীর সংরক্ষিত আসন ও প্রতিনিধিত্ব

নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের নারী সমাজের পশ্চাৎপদ ও অধস্তন অবস্থা পরিবর্তন করে দেশ ও সমাজের পরিপূর্ণ বিকাশ তথা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে রাজনৈতিক

প্রক্রিয়ায় নারীদের ব্যাপক মাত্রায় সক্রিয় অংশগ্রহণ খুবই জরুরী। নারীকে রাজনীতি থেকে বাদ দিয়ে কোন গণতান্ত্রিক ও সমতা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশের নারীরা আজ জাতীয়, স্থানীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধিত্ব দাবী করছে। বাংলাদেশের নারীরাও পিছিয়ে নেই। কেননা বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতিনিধিত্ব একেবারেই অপ্রতুল। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ একটি অন্যতম প্রধান নীতি নির্ধারণী সংস্থা। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পুরুষতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোয় পুরুষের বিপরীতে নারীর পক্ষে বিজয়ী হয়ে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার অর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট তৎকালীন সময়ে তৈরী হয়নি। সে সময়ের দাবী ছিল পূর্ব ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আসন সংরক্ষণের মাধ্যমে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫(ক) অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদে নারীর জন্য আসন সংখ্যা সংরক্ষিত রেখে পরোক্ষ নির্বাচনের বিধান রাখা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের (১৯৭২) ৬৫নং ধারার অধীনে জাতীয় সংসদে ৩০০টি আসনের সাথে অতিরিক্ত ১৫ টি আসন নারী প্রতিনিধিত্বের জন্য ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালের নির্বাচনের সময় সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৩০ এবং সংরক্ষণের মেয়াদ কাল ১৫ বছর করা হয়। ১৯৮৭ সালের প্রথম দিকে অর্থাৎ সংবিধান প্রবর্তনের ১৫ বছর পূর্তির সময় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। তাই শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ১৯৮৮ সালের জাতীয় সংসদে নারীর জন্য কোন সংরক্ষিত আসন ছিল না। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালের দশম সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের সাংবিধানিক ব্যবস্থা বলবৎ হয়। এতে করে এই সংশোধনীর মাধ্যমে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের মেয়াদ আরও ১০ বছর বাড়ানো হয়। সংবিধানের দশম সংশোধনীর মাধ্যমে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের সময় ২০০১ সালের এপ্রিলে শেষ হয়ে যায়। ফলে দীর্ঘদিন সংরক্ষিত মহিলা আসনে মহিলা প্রতিনিধি ছিল না। চতুর্দশ সংশোধনী বিল পাশ হয় ২০০৪ এর ১৬ই মে এবং এই সংশোধনীতে সংরক্ষিত নারী আসন বাড়িয়ে ৪৫টি করা হয় পরবর্তী ১০ বছরের জন্য। সংসদের রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে এসব আসনে নির্বাচন হবে বলে বিধান করা হয়েছিল। প্রথম সংসদে (১৯৭৩-১৯৭৫) সংরক্ষিত মহিলা আসনের সবগুলোই ছিল আওয়ামীলীগ দলীয় সদস্য। তৃতীয় সংসদে (১৯৮৬-১৯৮৭) ৩০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের অধিকারী হয় জাতীয় পার্টির মনোনীত সদস্যরা। চতুর্থ সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের বিধান না থাকায় কোন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হতে পারেনি। পঞ্চম সংসদে (১৯৯১-১৯৯৫) সংরক্ষিত ৩০ জন মহিলা আসনের মধ্যে ২৮ জন বি এন পি মনোনীত ২ জন জামায়াত ইসলামী মনোনীত সদস্য ছিল। ষষ্ঠ সংসদে (১৯৯৬-১৯৯৬) ৩০ জন মহিলা সদস্য সবাই ছিলেন বি এন পি দলীয় সদস্য। উল্লেখ্য যে এই সংসদের মেয়াদ ছিল মাত্র কয়েকদিন। সপ্তম সংসদে (১৯৯৬-২০০১) সংরক্ষিত মহিলা আসনে ২৭ জন আওয়ামীলীগ ও ৩ জন জাতীয় পার্টির দলীয় সদস্য ছিল। অষ্টম সংসদের শেষের দিকে

সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী অনুযায়ী ২০০৫ এর সেপ্টেম্বরে সংরক্ষিত নারী আসনের যে ৪৫ জন নারী সদস্য নির্বাচিত হন তাদের মধ্যে বিএনপির ৩৯জন, জামায়াত ইসলামীর ৩ জন, জাতীয় পার্টির ২ জন ও ইসলামী ঐক্যজোটের ১ জন। সংরক্ষিত মহিলা আসনের সকল মহিলা সদস্য বাস্তবে পুরুষ সংসদ সদস্যের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। ফলে সংসদের সাধারণ আসনের যে রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, সেই দলের মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচন সুনিশ্চিত ছিল। ৩০ টি সংরক্ষিত আসনে কখনই ভোটাভোট হয়নি। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতেন দলীয় প্রার্থীরা। ১৯৭৩ থেকে ২০০১ পর্যন্ত সাধারণ আসনে নির্বাচিত মহিলা সাংসদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

সারণি-৩: জাতীয় সংসদে সাধারণ ৩০০ আসনে নির্বাচিত মহিলা সাংসদ

বছর	প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা	নির্বাচিত মহিলা সাংসদ
১৯৭৩	০২	-
১৯৭৯	-	০২
১৯৮৬	১৫	০৫
১৯৮৮	-	০৪
১৯৯১	৩৯	০৬
১৯৯৬	৩৬	০৭
২০০১	৩৭	০৬

সূত্র: হোসেন, সেলিনা ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, নারীর ক্ষমতায়ন : রাজনীতি ও আন্দোলন, পৃষ্ঠা-৩৬, ঢাকা

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে পার্লামেন্টে যৌক্তিক ও কার্যকর প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন। আপাত দৃষ্টিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক শীর্ষ পদে দু'জন নারীর অবস্থান কিংবা নেতৃত্ব দেখা গেলেও সার্বিক ক্ষেত্রে তা কখনও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিকাশ হয়েছে বলা যাবে না। আজ দুই নেত্রী নিজের অবস্থান, কাজে, কর্মে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়, কর্মকাণ্ডে অনেক যোগ্য ও দক্ষ। কিন্তু তাদের রাজনীতিতে আগমন ঘটেছে তাদের পূর্বসূরীর অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দলের হাল ধরতে। এ ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমানের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগানো হয়েছে। দলের ভাঙ্গন রোধ করতে কিংবা জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে দলের নেতাদের এর কোন বিকল্প ছিল না। বর্তমান সময়ে তারা প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী হয়ে ভূমিকা পালন করছেন। নারী সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে নারী স্বার্থ সংরক্ষণে তাদের ব্যাপক ভূমিকা চোখে পড়ে না কিংবা অনেক সময় সম্ভবও হয়না। সংসদের সাধারণ আসনে যারা সরাসরি নির্বাচিত হয়েছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ যোগ্যতা বলে নির্বাচিত হলেও অনেকে আবার পারিবারিক প্রভাব, সামাজিক প্রতিপত্তি, অন্যান্য সুবিধা ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়েছেন। তাদের ভূমিকাও তেমন উল্লেখ্যযোগ্য নয় নারী ইস্যুতে। সংরক্ষিত আসনে নারীদের ভূমিকা হতাশাব্যাঞ্জক এবং

অনেক ক্ষেত্রে তা বিতর্কিত। ৮০র দশকে তাদের ভূমিকাকে ব্যঙ্গ করে অভিহিত করা হয়েছিল ৩০ সেট অলংকার হিসাবে। দলের পুতুল সমর্থক হয়েই তারা ছিলেন। পারিবারিক বা সামাজিক কাঠামোয় যেমন তাদের সাথে পুরুষের আচরণ ছিল, সংসদের মধ্যে তার চর্চা চলত বলেও অভিযোগ পাওয়া যায় যা সংসদে নারীর ভূমিকাকে বাধাগ্রস্ত করে।

সংরক্ষিত আসনে বেশির ভাগ নারীই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত বা সক্রিয় ছিল না বলে রাজনীতি ক্ষেত্রে তারা অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ। এটা তাদের হীনমন্যতার কারণ হত। সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যরা তাদের সীমিত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নারী ইস্যু তথা নারীর রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার আদায়ে সাহসী বা সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে না। সুদৃঢ় ক্ষমতার ভিত্তি এতে তৈরী হয় না। প্রত্যক্ষ নির্বাচন থেকে যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োগ ঘটানো যায় পরোক্ষ নির্বাচনে তা সম্ভব না। ফলে নির্বাচিত সদস্যদের সমমর্যাদা থেকে তারা বঞ্চিত। পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি জনগণের সাথে নারীদের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করে না ফলে নারীদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকা গড়ে উঠে না। বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন শীর্ষক প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং উইমেন ফর উইমেন এর প্রেসিডেন্ট মাহমুদা ইসলাম বলেন “একটি সংরক্ষিত মহিলা নির্বাচনী এলাকা বস্তুত ১০ টি প্রত্যক্ষ সাধারণ নির্বাচন এলাকার সমান। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত একজন মহিলা সদস্যদের বিপরীতে একই নির্বাচকমণ্ডলী ও নির্বাচনী এলাকায় ১০ জন সরাসরি নির্বাচিত পুরুষ সদস্য ছিলেন। এমন বিসদৃশ্য পরিস্থিতিতে, মহিলা সদস্যগণ পুরুষ সদস্যের অনুরূপ কর্তৃত্ব ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দাবী করতে পারেনি। পরোক্ষ নির্বাচনে ব্যাপক মাত্রায় গণসংযোগ সম্ভব নয়”।

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো “২০০৭ঃ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নারী” শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠক, ১২ অক্টোবর ২০০৬, আয়োজনে দৈনিক প্রথম আলো ও উইমেন স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সারণি-৪: জাতীয় সংসদে নারী সদস্য, ১৯৭৩ - বর্তমান

সংসদ	সংরক্ষিত আসন	সাধারণ আসন	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	জামায়াত	ইসলামী ঐক্যজোট	মোট
১ম	১৫	-	১৫(স)	-	-	-	-	১৫
২য়	৩০	২	-	৩০+২(স+সা)	-	-	-	৩২
৩য়	৩০	৫	১(সা)	-	৩০+৪(স+সা)	-	-	৩৫
৪র্থ	-	৪	-	-	৪(সা)	-	-	৪
৫ম	৩০	৫	৪(সা)	২৮+১(স+সা)	-	২(স)	-	৩৫
৬ষ্ঠ	৩০	৩	-	৩০+৩(স+সা)	-	-	-	৩৩
৭ম	৩০	৮	২৭+৩(স+সা)	৩(সা)	৩+২(স+সা)	-	-	৩৮
৮ম	৪৫	৬	২(সা)	৩৯+৩(স+সা)	২+১(স+সা)	৩(স)	১(স)	৫১
সর্বমোট	২১০	৩৩	৪২+১০	১২৭+১২	৩৫+১১	৫	১	২৪৩

সূত্র: ফিরোজ, জালাল (২০০৩), “পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে : বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা” পৃষ্ঠা- ১৫৮, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সচিবালয় থেকে গৃহীত

সরকার ব্যবস্থায় কেবিনেট একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মন্ত্রীপরিষদ শাসন ব্যবস্থার সুবাদে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যদের মধ্য থেকেই কেবিনেটের সদস্যরা নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে এ পর্যন্ত যতটি ক্যাবিনেট গঠন করা হয়েছে সেখানে নারীর উপস্থিতি অনেক কম।

সারণি-৫: বিভিন্ন কেবিনেটে মহিলা সদস্য সংখ্যা (১৯৭২--বর্তমান)

সরকার	মোট সদস্য	মহিলা সদস্য	শতকরা হার
শেখ মুজিব (১৯৭২-৭৫)	৫০	২	৪.০
জিয়াউর রহমান (১৯৭৯-৮২)	১০১	৬	৫.৯৪
এইচ, এম, এরশাদ (১৯৮২-৯০)	১৩৩	৪	৩.০
বেগম খালেদা জিয়া (১৯৯১-৯৬)	৩৯	৩	৭.৬৯
শেখ হাসিনা (১৯৯৬-২০০০)	৪৬	৪	৮.৬৯
বেগম খালেদা জিয়া (২০০১-২০০৬)	৬০	৩	৫.০

Source: Compiled from Muhammad Mahmudur Rahman “Empowerment of Women in Bangladesh : An Analysis of Theoretical perspective” Social Science Journal Vol-10, Rajshahi University 2005, P-205

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের পক্ষে বাধাসমূহ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যেখানে নারী পুরুষের সমানাধিকারের কথা রয়েছে সে ক্ষেত্রে বাস্তব চিত্রটি ভিন্নরূপ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ অনেক সীমিত। সংরক্ষিত আসনে নারীর পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি প্রকৃত জনপ্রতিনিধি হিসাবে নারীর ভূমিকাকে অনুজ্জ্বল করে তোলে। সেই ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু করে আজ বিংশ শতকেও নারীর জনপ্রতিনিধিত্ব পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে ঘুরপাক খাচ্ছে। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু নারী স্ব-মহিমায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উজ্জ্বল হয়ে থাকলেও সার্বিকভাবে জনপ্রতিনিধি হিসাবে নারীর বিকাশ ঘটেনি। এর পিছনে অবশ্য শিক্ষা, ধর্ম, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা ও অন্যান্য কিছু কারণ রয়েছে। এগুলো একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

অতীত ঐতিহ্য

ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, পাকিস্তান আমলে ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীরা থেমে থাকেনি। আজকের স্বাধীন বাংলাদেশেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইস্যুতে নারীরা মিছিলের

অগ্রভাগে। তবুও এখনকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামোয় নারীর প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব অতি নগণ্য। স্বাধীনতাভোর কালে আর্থ-সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা লাভ করেছে তা মূলত ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর প্রতিফলন স্বরূপ। বৃটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলের মত বর্তমানে বাংলাদেশেও রাজনীতিতে যৌক্তিক মাত্রায় নারী প্রতিনিধিত্বের মাত্রা বৃদ্ধি পায়নি বরং আগের কাঠামোই অনেকটা ধরে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন সরকার আমলে নারী প্রতিনিধিত্বে সংরক্ষিত ব্যবস্থা থাকলেও তা প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পক্ষে আশানুরূপ নয়।

দারিদ্র্য ও শিক্ষার অভাব

দরিদ্র মেয়েদের অনেক সময় সার্বিক বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে দেয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ নারীই সাংসারিক কাঠামোয় আবদ্ধ। কেউ কেউ বিভিন্নমুখী কর্মক্ষেত্রে কর্মরত আছে। যেখানে নিম্নবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত নারীরা ক্ষুধার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চালাচ্ছে প্রতিনিয়ত, স্বল্প মাথা পিছু আয় নিয়ে জীবন যাত্রার মানকে সহনীয় পর্যায়ে আনতে হিমশিম খাচ্ছে, সেখানে নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে উঠা খুবই কঠিন ব্যাপার। অর্থনীতিই রাজনীতির উন্নয়নের পূর্বশর্ত এই মতবাদ তখন সামনে এসে দাঁড়ায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমর্থন না পেলে বা স্বাবলম্বী না হলে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কখনই আশানুরূপ হবে না। তাছাড়া এখনকার রাজনীতি প্রভাব এবং টাকা নির্ভর। টাকা ও সম্পদ কিংবা প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী পুরুষেরাই নির্বাচনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারী। সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতা নারীকে নিজ মেধা ও যোগ্যতা গুণে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করেছে। অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে শিক্ষার ব্যাপারটি। সাধারণত দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার স্বর্ণালী সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেও এ ক্ষেত্রে ছাড় দিতে হচ্ছে বেশি নারীদের। দরিদ্র পরিবারে সীমিত আয়ে ছেলেরাই পাচ্ছে পড়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার। অনেক মেয়েরা হচ্ছে বঞ্চিত। শিক্ষার অভাব নারীর মধ্যে অধিকার সংক্রান্ত বোধগুলোকে সুপ্ত করে রাখে। শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ নারীর মধ্যে রাজনৈতিক তথ্য ও জ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটে না। তাই নারীরা বিশাল রাজনৈতিক অঙ্গনে নিজেদের তুলে ধরতে পারে না।

রক্ষণশীল ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন

আমাদের দেশের রক্ষণশীল ও সামাজিক অনুশাসন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বের পথে অন্যতম বাধা। সামাজিক ও ধর্মীয় শাসন উপেক্ষা করে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নারীর পক্ষে সহজ নয়। এদেশের পারিবারিক, সামাজিক, ও রাজনৈতিক জীবনে ধর্মীয় প্রভাব ব্যাপক মাত্রায় পরিলক্ষিত। রক্ষণশীল ধর্মীয় ব্যবস্থা নারীর পর্দা প্রথার পক্ষে। তাছাড়া নানা ফতোয়ার শিকার হচ্ছে নারীরা। রক্ষণশীল সমাজও নারীকে রাজনীতিতে দেখতে পছন্দ করে না। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ ও প্রথম আলোর যৌথ উদ্যোগে “২০০৭ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নারী - শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে ড. নাজমা চৌধুরী বলেন “আমরা নারী বাস করছি এমন একটি সমাজ ব্যবস্থায় যা কিনা পিতৃতান্ত্রিক এবং যার সঙ্গে রক্ষণশীল ও মৌলবাদী ধ্যান ধারণার ক্রমাগত মিশ্রণ ঘটেছে”।

সূত্র: (দৈনিক প্রথম আলো “২০০৭ঃ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নারী” শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠক, ১২ অক্টোবর ২০০৬, আয়োজনে দৈনিক প্রথম আলো ও উইমেন স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামে নারী অতীত বর্তমান শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়, পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা মূল্যবোধের কারণে নারীরা অত্যন্ত কাছের মানুষ স্বামী, বাবা, ভাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে বাধা দেন প্রচণ্ডভাবে। ফলে পারিবারিক বাধা উপেক্ষা করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ সম্ভব হয়ে উঠেন।

পুরুষতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি

আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পুরুষতান্ত্রিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মাহমুদা ইসলাম এ দেশের রাজনীতিকে ‘পুরুষের বিশ্ব’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ দেশের পুরুষরাই দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। যদিও দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের শীর্ষে অবস্থান করছে নারী তথাপি তাদের সিদ্ধান্ত, নীতি নির্ধারণসহ সবকিছুতে পুরুষ উপদেষ্টারা ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া রাজনীতিতে তাদের আগমন ঘটেছে বাবা বা স্বামীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। আমাদের রাজনৈতিক সমাজ পুরুষের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব, রাজনৈতিক কর্মসূচিতে প্রত্যক্ষ সক্রিয়তা যেভাবে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছে নারীর বেলায় তা সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন পুরুষ তার পেশা ও ব্যবসার বাইরে এলাকায় বিভিন্ন সমাজকর্মমূলক ভূমিকায় সক্রিয় থাকে বলে তাদের পরিচিতি বা প্রভাব সহজেই পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলো মনোনয়নের ক্ষেত্রে এদেরকে বেছে নেয়। দুর্বল জনসংযোগ বা জনসংযোগহীন নারীরা তাই পিছিয়ে রাজনীতিতে।

নিম্নমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি

আমাদের দেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতি উন্নত নয় বরং বলা চলে নিম্ন মূল্যবোধ সম্পন্ন। এখানে যোগ্যতা ও দক্ষতা, মেধার পরিবর্তে টাকা ও পেশিজ্ঞতির উপর সবকিছু নির্ভর করে। চর দখলের মত মাঠ দখলের খেলা চলে। অনেক সময় অযোগ্য লোকও টাকা ও প্রভাব খাটিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়। গরীবের আর্থিক অসহায়ত্ব তারা কাজে লাগায়। সন্ত্রাস, সহিংসতা, বোমাবাজি, চাঁদাবাজি বিরাজিত রাজনৈতিক অঙ্গনের এই কলুষিত পরিবেশে নারীর পক্ষে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। টাকা বা সম্পদ কোনটারই মালিক নয় নারীরা। নারীর ভোটদান প্রক্রিয়াও পুরুষ অভিভাবক দ্বারা নির্ধারিত। পছন্দসই প্রার্থী বাছাই করে ভোটদানের ক্ষমতা এদেশের অধিকাংশ নারীর নেই। গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি অনেক বেশি প্রযোজ্য। তাছাড়া রাজনৈতিক অঙ্গনে ও সার্বিক সামাজিক পরিসরে নারীরা নিরাপত্তাহীন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অনেক সময় মিছিলরত থাকা মহিলা রাজনৈতিক কর্মীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বর্বর আক্রমণ চালায় যা

দৃষ্টিকটুই নয় ভীষণ বেদনাদায়ক। এই দৃশ্যগুলো রাজনীতিতে নারীদের নিরুৎসাহিত করে। আবার দেখা যায় আমাদের দেশে অনেক নারী আছেন যারা নিজেরাই পছন্দ করেন না রাজনীতিতে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে। এটা পুরুষের কাজ বলে তারা মনে করে। শুধু গ্রামে নয় শহর এলাকার অনেক শিক্ষিত নারীও এরূপ ধারণা পোষণ করে। মা বা স্ত্রী হিসেবে তারা নিজেদের ভাবতেই বেশি পছন্দ করেন।

পারিবারিক দায়িত্ব ও পরিস্থিতিগত প্রতিবন্ধকতা

নারীরা সবসময়ই একটি সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ। নারীরা শিশুকাল থেকেই সংসার, মাতৃত্ব, দায়িত্ব এই বিষয়গুলো দেখতে দেখতে, শিখতে শিখতে বড় হয়ে সাংসারিক কাঠামোয় নিজেকেও একজন সাংসারিক দায়িত্ব পালনের অন্যতম ধারক বলে মনে করে। দিনের অধিকাংশ সময় সংসারে ব্যয় হয় নারীর। ইচ্ছে থাকলেও একজন নারীর রাজনীতি অঙ্গনে তাই প্রবেশের বা রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা হয়ে উঠে না। পুরুষ কিন্তু তার পেশাগত দায়িত্ব পালন শেষে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে হাতে অনেক সময় পান। কারণ তিনি গৃহস্থালির কাজের সাথে যুক্ত থাকেন না। পেশাজীবী নারীরা তো আরও ব্যস্ত পেশা ও সংসার এই দুই কর্মক্ষেত্রে। গর্ভাবস্থায়, মাতৃত্ব এই প্রাকৃতিক অবস্থাজনিত বিষয়গুলো নারীকে মোকাবিলা করতে হয়। বিভিন্ন নারী চিন্তাবিদরা সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক দলগুলোকে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা বলে মনে করেন। কেননা প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রে যথাযথভাবে নারী এজেন্ডার প্রতিফলন হয়নি বলে তারা মনে করেন।

সাম্প্রতিক কালের ভাবনা: সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন

দেশ ও সমাজের উন্নয়ন, প্রগতিশীল চিন্তার বিকাশ এবং গণতান্ত্রিক সমাজের বাস্তব রূপায়ণের জন্য নারীর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার গুরুত্ব অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। রাজনৈতিক অঙ্গন এবং জাতীয় সংসদে বাংলাদেশের নারীর যথার্থ প্রতিনিধিত্ব নারী-পুরুষের সমান অংশীদারিত্বই নিশ্চিত করবে না গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকেও অনেক বেশী সুসংহত এবং মজবুত করবে। সাম্প্রতিক সময়ে তাই জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন, পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি, সংরক্ষিত মহিলা আসনের মহিলাদের ক্ষমতাহীনতা, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর প্রান্তিক অবস্থান এ বিষয়গুলো বিভিন্ন মহলে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে বয়ে আনা বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবী আজকের সময়ের বাস্তবতা। সংরক্ষিত মহিলা আসনকে পুনর্বিন্যাস ও মর্যাদার আসনে উন্নীত করার জন্য বিভিন্ন নারী সংগঠন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সুশীল সমাজ, রাজনীতিবিদসহ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এ বিষয়ে তাঁদের সুচিন্তিত মন্তব্য পত্র পত্রিকা কিংবা সভা সমিতিতে প্রকাশ করেছে, প্রচার করেছে। প্রথম শ্রেণীর জনপ্রিয় পত্রিকা দৈনিক প্রথম আলো এ সংক্রান্ত বিষয়ে গোল টেবিল বৈঠক করেছে। এখানে মত বিনিময় হয়েছে এর সপক্ষে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জরিপেরও আশ্রয় নিয়েছে। নারী সংগঠনগুলো প্রায় দুই যুগ ধরে এর পক্ষে মতামত দিয়ে আসছে। সম্মিলিত নারী সমাজ

২০০০ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারীর রাজনৈতিক আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবি জানায়। ২০০১ সালের এপ্রিলে অষ্টম সংসদে সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে এ দাবী আরও বেশি জোরদার হয়ে উঠে। জাতীয় সংসদে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য সংসদে বিল উত্থাপন করেন কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যা গরিষ্ঠতার অভাবে তা আর পাশ হয়নি। বিরোধী দল সংসদে হাজির হয়ে উত্থাপিত বিলের প্রতি সমর্থন জানায়নি। ফলে সপ্তম সংসদেই ঐ পদ্ধতির বিলুপ্তি ঘটেছে। সে সময়ের বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বাড়াবেন এবং তাতে সরাসরি নির্বাচন হবে। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নেতৃত্বের সাথে এক সাক্ষাতকার কালে তিনি এ কথা বলেন। ২০০৪ সালে অষ্টম সংসদের শেষের দিকে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫ এ উন্নীত করলেও সরাসরি নির্বাচনের ব্যাপারটি উপেক্ষা করে গেছেন।

সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ও তার সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক থাকলেও বিভিন্ন নারী সংগঠন, নারী চিন্তাবিদ, আইন বিশেষজ্ঞ ও সুশীল সমাজ সবাই সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে। বেসরকারি সংস্থা নারী পক্ষ থেকে বলা হয়, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩০টি বাড়িয়ে ৬৪টি করা হোক। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি জেলা হবে একটি মহিলা আসন। মহিলা প্রার্থী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। নারী সংগঠন উইমেন ফর উইমেন এর দাবী হল মহিলা আসন ৬০ টিতে উন্নীত করা এবং এসব আসনে মহিলা ভোটারদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবার পক্ষে মতামত দেন। সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা এবং নির্বাচন সংক্রান্ত একটি বিল জাতীয় পার্টির সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া উত্থাপন করেন। বিলটি সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর বিল ১৯৯৭ নামে উত্থাপিত হয়। ঐ বিলে তিনি ৩০০ আসনের জাতীয় সংসদের ১০০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা এবং জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে এসব মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত করার প্রস্তাব রাখেন। প্রস্তাবে বলা হয় নির্বাচন কমিশন এজন্য ১০০টি একক নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ করবে।

এখানে আরও বলা হয় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে নিজ নিজ দলের প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশ প্রার্থী হতে হবে মহিলা। আর এভাবে মনোনয়ন দেয়া না হলে সংশ্লিষ্ট দলের অন্য প্রার্থীদের মনোনয়ন ঐ দলের ন্যায় বলে বিবোচিত হবে। ২০০০ সালের ২৮ জুন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পক্ষে ব্যারিস্টার তানিয়া আমীর সংসদে ‘সংরক্ষিত নারী আসন বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় খসড়া বিল ২০০০’ নামে একটি প্রস্তাব সংসদে পেশ করেন। এই প্রস্তাবে তিনি জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা ৪৫০টিতে উন্নীত করে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে ১৫০ জন মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত করার প্রস্তাব করেন। ঐ ১৫০টি আসন থাকবে সংরক্ষিত। বর্তমানে ৩০০ আসনের সংসদে পাশাপাশি অবস্থানকারী দুটি আসন মিলে একটি মহিলা আসন হবে। ভোটারদের ভোট থাকবে দুটি। একটি সাধারণ ভোট এবং মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত ভোট। সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. কামাল হোসেন সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচনের উপর গুরুত্ব দেন। এ ক্ষেত্রে তিনি নারী

প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত বলে মনে করেন। তিনি নির্বাচন পদ্ধতির গুণগত পরিবর্তনের অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করেন। সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন বিষয়ে মতামত জানার জন্য জরিপেরও আশ্রয় নেয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা “দৈনিক প্রথম আলো” ২০০০সালের ৭ থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত দেশব্যাপী এক জরিপ চালায় এ বিষয়ে। জরিপে ছাত্র শিক্ষক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, এনজিও কর্মী, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, ঠিকাদার, বাসচালক, কৃষক, গৃহিনী ও চাকুরিজীবীসহ বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মানুষ মতামত প্রদান করেন। জরিপে অংশ নেয় মোট ৬০৮৫ জন। উত্তর দাতার মধ্যে ৪৪০০ জন (৭২.৩১%) মনে করে নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন হওয়া উচিত। নারী আসনে সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচন হওয়া উচিত নয় বলে মনে করে ২২৭ জন (২০.১৬%)। আর ৪৫৮ (৭.৫৩%) উত্তরদাতা এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেনি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৯৭ সালে পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারীরা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যও দেখিয়েছেন। অথচ সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারনী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে তা হচ্ছে না। ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি এনালাইসিস অ্যান্ড অ্যাডভোকেসী (ইউপা) জরিপ চালিয়েছে। এখানকার জরিপের ফলাফলও সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে। ৭৮.৬% উত্তর দাতা সংসদে নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচন চান। উত্তর দাতাদের ৫০.৫% মনে করে সংসদে নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এবং সরাসরি নির্বাচন হলে নারীর উপর চলমান বিভিন্নমুখী নির্যাতন ও সহিংসতার (এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, নারী পাচার) বিরুদ্ধে নারীর কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ইউপার এ জরিপ ফলাফল ১লা জুলাই ২০০৩ এ এক আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

সারণি-৬: সংসদে নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচন প্রবর্তনের পক্ষে মতামত

অঞ্চল	নারী-পুরুষ	পুরুষ	নারী
সমগ্র বাংলাদেশ	৭৮.৬	৭৬.৪	৮০.৮
গ্রামীণ এলাকা	৭৮.০	৭৫.৮	৮০.১
শহর এলাকা	৮০.৩	৭৮.০	৮৩.১
ঢাকা বিভাগ	৮২.৭	৮২.৫	৮২.৫
চট্টগ্রাম বিভাগ	৮০.১	৭৭.১	৮২.৮
খুলনা বিভাগ	৭৩.৫	৬৯.২	৭৭.৭
রাজশাহী বিভাগ	৭৫.২	৭২.০	৭৮.৪

সূত্র: নিউজ নেটওয়ার্ক রিপোর্ট, গৌতম মন্ডল সম্পাদিত, প্রকাশকাল ২০০৩

অতি সম্প্রতি ৬ই সেপ্টেম্বর ২০০৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিস বিভাগ ও দৈনিক প্রথম আলো গোল টেবিল বৈঠকে ২০০৭, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নারী-শীর্ষক আলোচনায় যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে তা হল, নারীর সরাসরি নির্বাচন, নির্বাচন প্রক্রিয়া, নির্বাচন কৌশল, নারী নীতি ও তার পরিবর্তন এবং নারীর ক্ষমতায়নের পথে

বাধাসমূহ। এই আলোচনায় ড. নাজমা চৌধুরী বলেন “আশির দশকে সংরক্ষিত নারী আসনের প্রতিনিধিত্ব আখ্যায়িত হয়েছিল ৩০ সেট অলংকার হিসাবে, ৯০ দশকে তারা সমর্থনের বিনিময়ে সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছেন। বিংশ শতকের শুরুতে তারা পরিণত হয়েছেন রাজনৈতিক দলের নিজস্ব এখতিয়ারভুক্ত অস্তিত্বে। এই উপলব্ধি থেকেও প্রয়োজন নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়ে সংরক্ষিত আসনের রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। (সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ১২ অক্টোবর ২০০৬)

দৈনিক প্রথম আলো আয়োজিত “নির্বাচনে নারীর মতামত প্রতিফলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়” শীর্ষক সাক্ষাৎকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং উইমেন ফর উইমেন এর প্রেসিডেন্ট ড. মাহমুদা ইসলাম বলেন, আমাদের দেশে সংরক্ষিত আসনে নারীরা যেভাবে আসছে তাতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হচ্ছে না। এর কারণ হচ্ছে তিনি তো সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছেন না। তিনি শুধু রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হিসাবে সেখানে উপস্থিত থাকছেন। তাছাড়া তিনি মনোনীত হওয়ায় নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় তো তার কোন সম্পৃক্ততা থাকছে না। সেই জন্যই আমরা দীর্ঘ দিন ধরে বলে আসছি নারীর আসনে সরাসরি নির্বাচন দরকার।” তিনি মনে করেন যদি কোন নারী সরাসরি নির্বাচন করে আসেন তাহলে তার একটা রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হয়। এভাবে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা অনেক আত্মবিশ্বাসী, সংসদে তাদের গ্রহণযোগ্যতাও অনেক বেশি বলে মনে করেন।

সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন যুক্তিতর্ক দেখা গেলেও নারী সংগঠনগুলো কিন্তু পরবর্তীতে সংরক্ষিত আসনে ১০০টি আসন নারীর জন্য রাখার পক্ষে মতামত দিয়েছেন এবং এটা অবশ্যই সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে। সরাসরি নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রবর্তন (সংরক্ষিত আসনে), নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো আগে দূর করতে হবে। রাজনৈতিকভাবে নারীকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন সভা, সেমিনার, সামাজিক আন্দোলন, গণ-সংযোগ এর মাধ্যমে তুর্গমূল পর্যায়ে তাদের সংগঠিত করতে হবে। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকার, এনজিও, নারী সংগঠন ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো কখনও একক ও প্রয়োজনে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। নিম্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রক্ষণশীল, ধর্মীয় সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক মাত্রায় জনমত গড়ে তোলার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে নারীরা নিজেরাই। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা নিতে পারে। নারী সংগঠনগুলোর ভূমিকাও এখানে অনেক জোরদার হওয়া উচিত।

বাংলাদেশের সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের ধারাবাহিকতায় দেখা যায় ১৯৭২ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা ১৫, ৩০ এবং ৪৫টি অর্থাৎ একেক সময়ের বাস্তবতায় নারী প্রতিনিধিত্বের হার নির্দিষ্ট হয়েছে। দাবী অনুযায়ী এ হার বৃদ্ধি পেতে পারে যা বিভিন্ন তরফ থেকে ১০০ থেকে ১৫০ পর্যন্ত উন্নীত করার সুপারিশ করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে জেভার বৈষম্য বিলোপের দৃষ্টিতে নারী সমাজ পার্লামেন্টে পুরুষের সমানুপাতিক আসন লাভের প্রত্যাশা সুদূরপ্রসারী হলেও মূলত এটাই লক্ষ্য। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বিশ্ব আর্থ-

সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতায় নারী পুরুষের সমান প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি এখন আর কল্পনাপ্রসূত বলা যাবে না। এ বিষয়টি সময়ের দাবী। দেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে নারী প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি ধাপে ধাপে এগিয়ে আসছে যার চূড়ান্ত ধাপ হবে নারী-পুরুষ সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব। তবে সাধারণ আসন এবং সংরক্ষিত আসন মিলে পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্বের পরিধি বেড়ে যাওয়া দেশের সার্বিক অবস্থার সাথে কতটুকু সংগতিপূর্ণ তা ভাবতে হবে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল এবং দরিদ্র দেশ। পাশাপাশি ক্ষুদ্রায়তন ও জনবহুল। ফলে বৃহদাকৃতির আইনসভার আর্থিক চাপ দেশের জন্য কতখানি সংগতিপূর্ণ এটাও ভাবতে হবে। পার্লামেন্টের পরিধির সাথে সরকারের পরিধিও গভীরভাবে সম্পর্কিত। তাছাড়া ভবিষ্যতে সংরক্ষিত আসন যতই বাড়ুক না কেন তা নারী প্রতিনিধিত্বের বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবেই স্বীকৃত। এ বিশেষ ব্যবস্থা বিশেষ বাস্তবতায় অনুসৃত হলেও তা নারীর প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সমানাধিকারের আপাত বিকল্প হতে পারে কিন্তু প্রকৃত সমানাধিকার নিশ্চিত করে না। এ কারণে সংরক্ষিত আসনের পরিবর্তে সাধারণ আসনেই সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি সাম্প্রতিক কালের ভাবনা হতে পারে। পর্যায়ক্রমে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যেতে পারে। সংবিধান, প্রচলিত আইন এক্ষেত্রে অন্তরায় তো নয়ই বরং বলা চলে অনেক বেশি উদার ও সহায়ক। এই সকল বিধি বিধান সর্বক্ষেত্রেই নারী প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে আসছে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোকে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিতে হবে। নেতৃত্বের বিকাশ ও নির্বাচনের প্রার্থী বাছাইয়ের সময় দলগুলোই যদি তাদের মোট আসনের বিপরীতে পর্যাপ্ত হারে নারীদের মনোনয়ন দেন এবং যথাযথ ভাবে সহযোগিতা করেন তাহলে সময়ের সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে নারী পুরুষের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে। এতে করে বাংলাদেশের গণতন্ত্র যেমন সুসংহত হবে, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নও ঘটবে।

তথ্য নির্দেশ

আল-কুরআন ।

আখতার, ফরিদা (সম্পাদিত), আট মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, পৃ-২৯, প্রকাশকাল-
মার্চ ২০০৪, প্রকাশক : নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন, বিচার ও
সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১লা আগস্ট ২০০৬ সাল পর্যন্ত সংশোধিত ।

তপতী সাহা, নারীর ক্ষমতায়ন : ধারণাগত কাঠামো ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, বাংলাদেশ উন্নয়ন
গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত, বিংশত তম খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা ১৪০৯ ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, রহমান, আশিফুর, “ভোটাদিকার বঞ্চিত নারী” শীর্ষক প্রতিবেদন, ৪
জুলাই ২০০১ ।

দৈনিক প্রথম আলো, রহমান, মতিউর, সম্পাদিকীয়, ২১ নভেম্বর ২০০৬ ।

দৈনিক প্রথম আলো, “২০০৭ : নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নারী” শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠক, ১২ অক্টোবর
২০০৬, আয়োজনে প্রথম আলো ও উইমেন স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

ফিরোজ, জালাল (২০০৩), পার্লামেন্টে কিভাবে কাজ করে : বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা,
পৃঃ-১৫৮, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা ।

মণ্ডল, পৌতম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ হতাশাবাঞ্ছকঃ
প্রধান বাধা রাজনৈতিক দল, প্রকাশকাল-২০০৩, প্রকাশনায়- নিউজ
নেটওয়ার্ক, ঢাকা ।

মান্নান, অধ্যাপক মোঃ আব্দুল ও মেরী, সামসুন্নাহার খানম, নারী ও রাজনীতি, পৃ-১৮৮-
১৯১, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার,
প্রকাশকাল- এপ্রিল ২০০৬, প্রকাশনায়- অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা ।

মাসিক প্রফেসর ক্যারেন্ট এ্যাফেয়ার্স, মার্চ ২০০৪ ও জুন ২০০৪ ।

রহমান, শাহীন, মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল : উন্নয়ন পদক্ষেপ, সেপ্টেম্বর ২০০৪,
৩৪তম সংখ্যা ।

হোসেন, সেলিনা ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), নারীর ক্ষমতায়নঃ রাজনীতি ও
আন্দোলন, পৃঃ৩৬, ঢাকা ।

Rahman, Mahmudur “Empowerment of Women in Bangladesh
: An Analysis of Theoretical perspective” Social
Science Journal Vol-10.Rajshahi University 2005